ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ২য় পত্র: ফিকহুল মুআশারাহ ও মুসলিম পারিবারিক আইন

ক বিভাগ: ফিকহুল মুয়াশারাহ (রচনামূলক প্রশ্ন)

গ্রন্থকার পরিচিতি (ইমাম ইবনে আবিদীন)

১. ইমাম ইবনে আবিদীনের বংশ পরিচয় এবং তার পরিবারের 'ইবনে আবিদীন' লকব বা উপাধিতে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা কর। (تحدث عن نسب الإمام ابن عابدين وعن سر شهرة أسرته بلقب عابدين)

২. ইমাম ইবনে আবিদীনের জীবন সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখ, যেখানে তার জন্ম, শৈশব, মৃত্যু এবং সিরিয়া অঞ্চলের তার মর্যাদার কথা থাকবে। (اكتب نبذة تاريخية عن حياة الإمام ابن عابدين، متناولا ولادته ونشأته ووفاته، ومكانته في الديار الشامية)

৩. ইমাম ইবনে আবিদীন তাঁর সমসাময়িক ফকীহগণের মধ্যে কোন উচ্চতর জ্ঞানগত উপাধি লাভ করেছিলেন এবং এ উপাধিটির অর্থ কী? (ما هو اللقب العلمي الرفيع الذي ناله الإمام ابن عابدين بين فقهاء عصره، وماذا يعني بهذا اللقب؟)

৪. ইবনে আবিদীনের শিক্ষাজীবনের গতিপথ অনুসন্ধান কর। শাফেয়ী মাযহাব থেকে হানাফি মাযহাবে তার পরিবর্তনের বিষয়টি স্পষ্ট কর। কোন শায়খ তাকে এ পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন? (تتبع مسار ابن عابدين التعليمي، موضحا تحوله من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي، ومن هو الشيخ الذي أمره بذلك؟)

৫. তাঁর যুগে হানাফি ফিকহকে ফাতওয়া ও বিচার ব্যবস্থার উৎস হিসেবে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে আবিদীনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। কীভাবে তিনি ফিকহী মাযহাবসমূহের জন্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে পরিণত হলেন? (بين دور الإمام ابن عابدين في تعيير الفقه الحنفي كمرجع للفتوى والقضاء في عصره، وكيف أصبح مرجعا معتمدا للمذاهب الفقهية)

৬. ইমাম ইবনে আবিদীনের আধ্যাত্মিক জীবন এবং তাসাউফের সাথে তার সম্পর্ক সম্পর্কে আলোচনা কর। তিনি যে সুফী তরিকাসমূহের সাথে যুক্ত ছিলেন, সেগুলোর নাম উল্লেখ কর। (تحدث من حياة الإمام ابن عابدين

الروحية وعلاقته بالتصوف، واذكر أسماء الطرق الصوفية التي انتسب إليها)
৭. 'রদ্দুল মুহতার' ছাড়া ইমাম ইবনে আবিদীনের অন্য পাঁচটি রচনার নাম উল্লেখ কর এবং সংক্ষেপে এ রচনাগুলোর প্রকৃতি বর্ণনা কর। (اذكر خمسة من مؤلفات الإمام ابن عابدين الأخرى غير رد المحتار، مع بيان طبيعة هذه المصنفات باختصار)
৮. ব্যবসায়ী পিতার ঘরে ইবনে আবিদীনের শৈশবের প্রকৃতি কেমন ছিল? তার সামাজিক পরিবেশ তার জ্ঞান অর্জন ও রচনায় কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল? (ما هي طبيعة نشأة ابن عابدين في بيت والده التاجر، وكيف أثرت بيئته الاجتماعية على تحصيله العلمي وانشغاله بالتأليف؟)
৯. ইবনে আবিদীনের জ্ঞানগত জীবনে দামেশক শহরের ভূমিকা আলোচনা কর। কেন তাকে (শামী/সিরীয়) উপাধি দেওয়া হয়েছিল? (ناقش الدور الذي لعبته مدينة دمشق في مسيرة ابن عابدين العلمية، ولماذا لقب بـ الشامي؟)
১০. শেষ যুগে হানাফি ফিকহকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে ইবনে আবিদীনের প্রচেষ্টা পর্যালোচনা কর এবং তার পরবর্তী ফকীহ ও ছাত্রদের উপর তার ফিকহের প্রভাব উল্লেখ কর। (استعرض جهود ابن عابدين في إحياء الفقه الحنفي في العصر المتأخر، مع ذكر أثر فقهه على العلماء والتلاميذ من بعده)

প্রশ্ন-১: ইমাম ইবনে আবিদীনের বংশ পরিচয় এবং তার পরিবারের 'ইবনে আবিদীন' লকব বা উপাধিতে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা কর।
(تحدث عن نسب الإمام ابن عابدين وعن سر شهرة أسرته بلقب عابدين)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে ত্রয়োদশ হিজরি শতাব্দীর মহান সংস্কারক, হানাফি মাযহাবের শেষ নির্ভরযোগ্য ফকিহ এবং সিরিয়ার ফাতওয়া জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন ইমাম ইবনে আবিদীন আশ-শামী (রহ.)। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে তার বংশীয় ঐতিহ্য এবং পারিবারিক আবহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ)

অর্থ: "তোমরা তোমাদের বংশপরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন কর, যাতে তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে পারো।"

এই হাদিসের আলোকে ইমাম ইবনে আবিদীনের বংশ পরিচয় ও তার পারিবারিক উপাধির ইতিহাস জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। তার বংশলতিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি এক সম্ভ্রান্ত, দ্বীনদার এবং বুজুর্গ পরিবারের সন্তান ছিলেন।

বংশ পরিচয় (আন-নাসাব):

ইমাম ইবনে আবিদীন (রহ.)-এর নাম ও বংশধারা অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ। তার পূর্ণ নাম ও বংশপরম্পরা নিম্নরূপ:

তিনি হলেন মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ইবনে আহমেদ ইবনে আব্দুর রহিম ইবনে নাজমুদ্দিন ইবনে মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন (রহ.)।

ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণের মতে, তার বংশধারা শেষ পর্যন্ত হযরত আলী (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ছিলেন 'সাদাতে হুসাইনী' বা নবী দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রা.)-এর বংশধর। এই উচ্চবংশীয় মর্যাদা তার ইলমি ও আমলি জীবনে এক বিশেষ নূর বা জ্যোতি হিসেবে কাজ করেছে। তার পূর্বপুরুষগণ প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব-স্ব যুগের আলেম ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্ব।

'ইবনে আবিদীন' লকব বা উপাধিতে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ:

ইমামের পারিবারিক উপাধি বা লকব হলো 'ইবনে আবিদীন' (ابن عابدين)। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ হলো 'আবিদীনের সন্তান' বা 'ইবাদতকারীদের বংশধর'। তার এই উপাধি লাভের পেছনে একটি চমৎকার ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপট রয়েছে।

১. পূর্বপুরুষের ইবাদত ও তাকওয়া:

ইমামের বংশলতিকার অন্যতম একজন ঊর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন (রহ.)। তিনি ছিলেন তার সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ বুজুর্গ ও আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি। দুনিয়াবী ভোগবিলাস ত্যাগ করে তিনি নিজেকে মহান আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন রাখতেন। তার ইবাদত, রিয়াজত এবং মুজাহাদা (সাধনা) এত উচ্চস্তরের ছিল যে, সমসাময়িক আলেম ও সাধারণ মানুষ তার চেহারায় এক বিশেষ নূরানি আভা দেখতে পেতেন।

২. 'জয়নুল আবিদীন' উপাধি লাভ:

মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন (রহ.)-এর অতিরিক্ত নফল ইবাদত, তাহাজ্জুদ এবং খোদাভীতির কারণে মানুষ তাকে ভালোবেসে 'জয়নুল আবিদীন' (زين العابدين) বা 'ইবাদতকারীদের অলংকার' নামে ডাকত। তিনি যেন ছিলেন সেই যুগের ইবাদতকারীদের শিরোমণি।

৩. বংশীয় পরিচিতি:

আরব সংস্কৃতির একটি নিয়ম হলো, কোনো ব্যক্তি যদি বিশেষ কোনো গুণে খ্যাতি লাভ করেন, তবে তার পরবর্তী বংশধরদের সেই নামের সাথে সম্পৃক্ত করে পরিচিত করা হয়। মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন (রহ.)-এর মৃত্যুর পর তার সন্তান ও পরবর্তী বংশধরদের 'ইবনে আবিদীন' বা 'সেই মহান আবেদ (ইবাদতকারী)-এর সন্তান' বলে সম্বোধন করা শুরু হয়। কালক্রমে এই নামটিই তাদের পারিবারিক উপাধি বা 'লাকাব'-এ পরিণত হয়।

পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রভাব:

এই উপাধিটি কেবল একটি নাম ছিল না, বরং এটি ছিল একটি দায়বদ্ধতা। ইমাম ইবনে আবিদীন নিজেও এই উপাধির যথার্থতা প্রমাণ করেছিলেন। তিনি তার পূর্বপুরুষদের মতো ইলম ও আমলের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তার জীবনের প্রতিটি

মুহূর্ত ছিল আল্লাহর হুকুম পালনে নিবেদিত। ফিকহের জটিল মাসআলা সমাধানের পাশাপাশি তিনি রাতের অন্ধকারে আল্লাহর দরবারে রোনাজারি করতেন, যা 'ইবনে আবিদীন' নামের সার্থকতা বহন করে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম ইবনে আবিদীন (রহ.) কেবল তার ইলমি পাণ্ডিত্যের জন্যই নন, বরং তার পারিবারিক আভিজাত্য ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'ইবনে আবিদীন' উপাধিটি তার পূর্বপুরুষের তাকওয়া ও আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের সাক্ষ্য দেয়। তিনি ছিলেন সেই মহান বৃক্ষের এক সুমিষ্ট ফল, যার শিকড় ছিল তাকওয়ার মাটিতে প্রোথিত এবং যার শাখা-প্রশাখা ইলমে ফিকহের আকাশে বিস্তৃত।

প্রশ্ন-২: ইমাম ইবনে আবিদীনের জীবন সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখ, যেখানে তার জন্ম, শৈশব, মৃত্যু এবং সিরিয়া অঞ্চলের তার মর্যাদার কথা থাকবে। (اكتب نبذة تاريخية عن حياة الإمام ابن عابدين، متناولا ولادته ونشأته ووفاته، ومكانته في الديار الشامية)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

মুসলিম উম্মাহর ক্রান্তিলগ্নে আল্লাহ তাআলা এমন কিছু মনিষীকে দুনিয়াতে পাঠান, যারা দ্বীনের সঠিক বুঝ ও ব্যাখ্যা দিয়ে উম্মাহকে পথপ্রদর্শন করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর এমনই এক মহান সংস্কারক ছিলেন আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবিদীন আশ-শামী (রহ.)। তিনি ছিলেন হানাফি ফিকহের 'খাতামুল মুহাক্কিকীন' বা সর্বশেষ গবেষক। তার জীবন ও কর্ম সিরিয়ার ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিচে তার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হলো।

জন্ম (আল-বিলাদাহ):

ইমাম ইবনে আবিদীন ১১৯৮ হিজরি সনে (মোতাবেক ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম জ্ঞানকেন্দ্র ও সিরিয়ার রাজধানী দামেশক (دمشق) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দামেশক তখন উসমানীয় খেলাফতের অধীন একটি সমৃদ্ধ নগরী। তার জন্ম এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক

অস্থিরতা থাকলেও ইলমি চর্চা ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি এক সম্ভ্রান্ত, ধনাঢ্য ও দ্বীনদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব ও বেড়ে ওঠা (আন-নাশআহ):

ইমামের পিতা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ছিলেন একজন সৎ ও ধর্মপরায়ণ ব্যবসায়ী। ফলে ইমামের শৈশব কেটেছে সচ্ছলতা ও দ্বীনি পরিবেশের মধ্যে।

- **কুরআন হিফজ:** শৈশবেই তিনি অত্যন্ত মেধার স্বাক্ষর রাখেন। খুব অল্প বয়সে তিনি পবিত্র কুরআনুল কারিম সম্পূর্ণ হিফজ করেন এবং তাজবিদ ও কিরাত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

- **পিতার সাহচর্য:** শৈশবে তিনি মাঝে মাঝে পিতার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বসতেন। কথিত আছে, তিনি দোকানে বসেও সর্বদা কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। ব্যবসার কোলাহল তাকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করতে পারত না।

- **প্রাথমিক শিক্ষা:** তিনি তৎকালীন দামেশকের শ্রেষ্ঠ কারী শায়খ সাইদ আল-হামাউয়ীর নিকট কুরআন ও তাজবিদ শিক্ষা করেন। এরপর তিনি নাহু, সরফ ও প্রাথমিক ফিকহ শাস্ত্র অর্জনে মনোনিবেশ করেন।

সিরিয়া অঞ্চলে তার মর্যাদা (আল-মাকানাহ ফি দিয়ারিশ শামি):

দামেশক তথা পুরো সিরিয়া (শাম) অঞ্চলে ইমাম ইবনে আবিদীন ছিলেন একচ্ছত্র আধিপত্যের অধিকারী—ক্ষমতার জোরে নয়, বরং ইলমের শক্তিতে। তাকে 'ফকিহুশ শাম' (সিরিয়ার ফকিহ) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

- **ফাতওয়ার কেন্দ্রবিন্দু:** তৎকালীন সময়ে দামেশকে অনেক বড় বড় আলেম ছিলেন, কিন্তু জটিল কোনো মাসআলায় সবাই আটকে গেলে সমাধানের জন্য ইবনে আবিদীনের দরজায় কড়া নাড়তেন। তার ফাতওয়াই ছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

- **বিচারকদের আস্থাস্থল:** উসমানীয় আদালতের বিচারকরা (কাজী) রায় প্রদানের ক্ষেত্রে তার কিতাব ও ফাতওয়ার ওপর নির্ভর করতেন। তার লিখিত 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থটি সিরিয়ার বিচার ব্যবস্থায় একটি অপরিহার্য কোড বা সংবিধানে পরিণত হয়েছিল।

- **ইলমি হালাকা:** দামেশকের মসজিদে তার দর্স বা পাঠদানের আসরে দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসত। তিনি তার ছাত্রদের শুধু কিতাব পড়াতেন না, বরং তাদের আমল ও আখলাক গঠনের মাধ্যমে যোগ্য ওয়ারিশ হিসেবে গড়ে তুলতেন।

ইন্তেকাল (আল-ওফাত):

ইলম ও আমলের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র খুব বেশি দিন দুনিয়ায় অবস্থান করেননি। তিনি ১২৫২ হিজরি সনে (মোতাবেক ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) মাত্র ৫৪ বছর বয়সে দামেশক শহরে ইন্তেকাল করেন।

- **জানাজা ও দাফন:** তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে পুরো দামেশক শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে। তার জানাজায় অগণিত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তাকে দামেশকের বিখ্যাত 'বাব আস-সগির' কবরস্থানে দাফন করা হয়। তার মাজার আজও সেখানে জিয়ারতকারীদের জন্য উন্মুক্ত এবং অনেকে সেখানে গিয়ে তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

ছক: ইমাম ইবনে আবিদীনের জীবনের প্রধান মাইলফলক [5]

পর্যায়	বিবরণ	সময়কাল/স্থান
জন্ম	সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে	১১৯৮ হিজরি, দামেশক
শিক্ষা	কুরআন হিফজ ও প্রাথমিক ইলম	শৈশবকাল
মাযহাব পরিবর্তন	শাফেয়ী থেকে হানাফি	যৌবনকাল
শ্রেষ্ঠ রচনা	রদ্দুল মুহতার (ফতোয়া শামী)	পরিণত বয়স
মৃত্যু	মহান রবের সান্নিধ্যে গমন	১২৫২ হিজরি, দামেশক

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীন (রহ.)-এর জীবন ছিল স্বল্পস্থায়ী কিন্তু কর্মে ছিল সুদূরপ্রসারী। ব্যবসায়ী পরিবারে জন্ম নিয়ে তিনি যেভাবে নিজেকে যুগের শ্রেষ্ঠ ফকিহ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, তা এক ঐতিহাসিক বিস্ময়। সিরিয়া অঞ্চলের আলেমদের মধ্যে তিনি আজও এক অনুকরণীয় আদর্শ। তার জীবন থেকে আমরা

শিখতে পারি যে, দুনিয়াবী প্রাচুর্য থাকলেও যদি ইচ্ছা থাকে, তবে ইলমের শিখরে পৌঁছানো সম্ভব। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন।

প্রশ্ন-৩: ইমাম ইবনে আবিদীন তাঁর সমসাময়িক ফকীহগণের মধ্যে কোন উচ্চতর জ্ঞানগত উপাধি লাভ করেছিলেন এবং এ উপাধিটির অর্থ কী?

(ما هو اللقب العلمي الرفيع الذي ناله الإمام ابن عابدين بين فقهاء عصره، وماذا يعني بهذا اللقب؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি জ্ঞানজগতে, বিশেষ করে ফিকহ ও ইফতার ময়দানে, উপাধি কোনো সাধারণ বিষয় নয়। এটি একজন আলেমের যোগ্যতা, দক্ষতা এবং গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি। ইমাম ইবনে আবিদীন (রহ.) তার যুগের অগণিত আলেম ও ফকিহদের ভিড়ে এমন এক উচ্চতর মাকামে পৌঁছেছিলেন যে, তাকে একটি বিশেষ ও সম্মানজনক জ্ঞানগত উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। এই উপাধিটি তার পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও ফাতওয়ার ক্ষেত্রে তার বিশ্বস্ততার প্রমাণ বহন করে।

জ্ঞানগত উপাধি (আল-লাকাবুল ইলমি):

ইমাম ইবনে আবিদীন তার সমসাময়িক ফকিহ, মুহাদ্দিস এবং বিচারকদের মাঝে যে বিশেষ উপাধিটি লাভ করেছিলেন, তা হলো 'আমীনুল ফাতওয়া' (أمين الفتوى)।

এছাড়াও পরবর্তী যুগের আলেমগণ তাকে 'খাতিমাতুল মুহাক্কিকীন' (خاتمة المحققين) বা 'গবেষকদের সিলমোহর/সর্বশেষ গবেষক' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে তার কর্মজীবনে 'আমীনুল ফাতওয়া' উপাধিটিই ছিল সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ও প্রসিদ্ধ।

উপাধিটির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:

১. আভিধানিক অর্থ: 'আমীন' শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাসী, আমানতদার বা রক্ষক। আর 'ফাতওয়া' হলো শরীয়তের বিধান বা সমাধান। সুতরাং, 'আমীনুল

ফাতওয়া'র শাব্দিক অর্থ হলো 'ফাতওয়ার আমানতদার' বা 'শরয়ী বিধানের রক্ষক'।

২. **পারিভাষিক অর্থ ও তাৎপর্য:** পরিভাষায় এবং তৎকালীন উসমানীয় প্রশাসনিক কাঠামোতে এই উপাধিটির অর্থ ও দায়িত্ব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক:

- **ফাতওয়ার বিশুদ্ধতা যাচাইকারী:** এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হতো, যার কাছে শরীয়তের মাসআলা-মাসাইল নিরাপদ থাকে। অর্থাৎ, তিনি শরীয়তের বিধান বর্ণনায় কোনো প্রকার শিথিলতা, ভুল ব্যাখ্যা বা স্বজনপ্রীতি করেন না।
- **চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী:** যখন কোনো জটিল বিষয়ে মুফতিদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিত, তখন 'আমীনুল ফাতওয়া' যা সিদ্ধান্ত দিতেন, সেটাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হতো।
- **মুফতিদের মুফতি:** দামেশকের প্রধান মুফতি হুসাইন আল-মুরাদির অধীনে তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কার্যত, প্রধান মুফতির পক্ষ থেকে আসা সকল ফাতওয়া তিনি যাচাই-বাছাই করতেন এবং স্বাক্ষর করতেন।

কেন তাকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল?

ইমাম ইবনে আবিদীনকে এই উপাধি দেওয়ার পেছনে বেশ কিছু যৌক্তিক কারণ ছিল:

- **গভীর পাণ্ডিত্য:** তিনি হানাফি মাযহাবের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' (মূল মত) এবং 'নাদিরে রিওয়ায়াহ' (বিচ্ছিন্ন মত)-এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারতেন। তিনি জানতেন কোনটি ফাতওয়ার উপযুক্ত আর কোনটি বর্জনীয়।
- **নিরপেক্ষতা:** ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি কারো দ্বারা প্রভাবিত হতেন না। তিনি কেবল কুরআন, সুন্নাহ এবং ফিকহী উসুলের ভিত্তিতে হক কথা বলতেন।

- **গবেষণা ও তাহকিক:** তিনি অন্ধভাবে পূর্ববর্তীদের নকল করতেন না। বরং প্রতিটি মাসআলার দলিল ও প্রেক্ষাপট যাচাই করতেন। ঐতিহাসিকরা তার সম্পর্কে বলেন:

(كَانَ مَرْجِعًا لِلْفَتْوَى فِي الدِّيَارِ الشَّامِيَّةِ وَأَمِينًا عَلَيْهَا)

অর্থ: "তিনি ছিলেন সিরিয়া অঞ্চলে ফাতওয়ার আশ্রয়স্থল এবং এর বিশ্বস্ত আমানতদার।"[7]

উপাধিটির প্রভাব:

'আমীনুল ফাতওয়া' হওয়ার কারণে তার লিখিত প্রতিটি শব্দ পরবর্তী ফকিহদের কাছে দলিলের মর্যাদা পেয়েছে। আজ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশ, তুরস্ক, মিশর এবং আরবের হানাফি ফকিহগণ কোনো ফাতওয়া দেওয়ার আগে দেখেন যে, 'আমীনুল ফাতওয়া' ইবনে আবিদীন এ বিষয়ে কী বলেছেন। তার রায়কে হানাফি মাযহাবের চূড়ান্ত রায় হিসেবে গণ্য করা হয়।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

পরিশেষে বলা যায়, 'আমীনুল ফাতওয়া' উপাধিটি ইমাম ইবনে আবিদীনের জন্য কেবল একটি সম্মাননা ছিল না, বরং এটি ছিল এক বিশাল দায়িত্বের স্বীকৃতি। তিনি তার জীবন, লেখনী এবং কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে গেছেন যে, তিনি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর দ্বীনের একজন বিশ্বস্ত আমানতদার ছিলেন। তার এই উপাধি মুসলিম উম্মাহকে এই বার্তা দেয় যে, ফাতওয়া প্রদানের দায়িত্ব কেবল জ্ঞানীদের জন্যই নয়, বরং যারা আমানতদার ও আল্লাহভীরু, তাদের জন্যই এই মহান দায়িত্ব।

প্রশ্ন-৪: ইবনে আবিদীনের শিক্ষাজীবনের গতিপথ অনুসন্ধান কর। শাফেয়ী মাযহাব থেকে হানাফি মাযহাবে তার পরিবর্তনের বিষয়টি স্পষ্ট কর। কোন শায়খ তাকে এ পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন?

تتبع مسار ابن عابدين التعليمي، موضحا تحوله من المذهب الشافعي إلى (المذهب الحنفي، ومن هو الشيخ الذي أمره بذلك؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

প্রতিটি মহামানবের জীবনে এমন কিছু বাঁক থাকে, যা তাদের গন্তব্য ও ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেয়। হানাফি ফিকহের শেষ সম্রাট ইমাম ইবনে আবিদীন আশ-শামী (রহ.)-এর শিক্ষাজীবনও ছিল বৈচিত্র্যময়। বিশেষ করে তার এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাবে স্থানান্তরের ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং আল্লাহর বিশেষ হিকমতপূর্ণ ফয়সালা। নিচে তার শিক্ষাজীবনের গতিপথ ও মাযহাব পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করা হলো।

শিক্ষাজীবনের সূচনা (বিদায়াতুত তালিম):

ইমাম ইবনে আবিদীন এক সম্ভ্রান্ত ও ইলমি পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় শৈশব থেকেই শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন।

- **কুরআন হিফজ:** তিনি খুব অল্প বয়সে পবিত্র কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। তার পিতা তাকে তৎকালীন দামেশকের শ্রেষ্ঠ কারী **শায়খ সাঈদ আল-হামাউয়ী (রহ.)**-এর নিকট সোপর্দ করেন। সেখানে তিনি তাজবিদ ও কিরাত শাস্ত্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আয়ত্ত করেন।

- **প্রাথমিক ফিকহ:** কুরআন হিফজের পর তিনি নাহু (ব্যাকরণ), সরফ এবং শাফেয়ী ফিকহের প্রাথমিক কিতাবগুলো অধ্যয়ন শুরু করেন। কারণ, তার প্রথম উস্তাদ শায়খ সাঈদ আল-হামাউয়ী ছিলেন একজন শাফেয়ী মাযহাবের আলেম।

শাফেয়ী মাযহাব থেকে হানাফি মাযহাবে পরিবর্তন (আত-তাহাওউলুল মাজহাবি):

ইমাম ইবনে আবিদীনের শিক্ষাজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল শাফেয়ী মাযহাব ত্যাগ করে হানাফি মাযহাব গ্রহণ করা। তিনি জন্মগতভাবে বা

পারিবারিকভাবে হানাফি ছিলেন না, বরং উস্তাদের নির্দেশে তিনি এই পরিবর্তন করেছিলেন।

যে শায়খ নির্দেশ দিয়েছিলেন:

যিনি তাকে এই পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি হলেন তার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শায়খ সাঈদ আল-হামাউয়ী (রহ.)। তিনি ছিলেন একজন কামেল ও বুজুর্গ ব্যক্তি।

পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা:

ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত আধ্যাত্মিক ও ইঙ্গিতপূর্ণ। শায়খ সাঈদ আল-হামাউয়ী একদিন লক্ষ্য করলেন যে, ইবনে আবিদীনের মেধা ও ধীশক্তি অসাধারণ। তিনি তার বাসিরাত (অন্তর্দৃষ্টি) দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ছেলে ভবিষ্যতে হানাফি মাযহাবের বিশাল খেদমত আঞ্জাম দেবেন।

একদিন শায়খ সাঈদ তাকে ডেকে বললেন:

(يَا بُنَيَّ، إِنِّي أَرَى أَنَّ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِفَةَ أَنْسَبُ لَكَ وَأَوْفَقُ لِطَبِيعَتِكَ، فَاتْرُكْ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَتَمَسَّكْ بِمَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ)

অর্থ: "হে বৎস! আমি দেখছি যে, ইমাম আবু হানিফার মাযহাব তোমার জন্য অধিক উপযোগী এবং তোমার স্বভাবের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই তুমি শাফেয়ী মাযহাব ছেড়ে ইমামে আজমের মাযহাব আঁকড়ে ধরো।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে, শায়খ স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তাকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। উস্তাদের এই নির্দেশ তিনি বিনাবাক্যে মেনে নেন।

হানাফি ফিকহে পদচারণা:

উস্তাদের নির্দেশের পর তিনি হানাফি ফিকহ অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি হানাফি ফিকহের মৌলিক কিতাবগুলো, যেমন— 'মুলতাকাল আবহুর', 'কানজুদ দাকায়েক', 'হেদায়া' ইত্যাদি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ হানাফি আলেম শায়খ শাকির আল-সালিমী আল-আক্কাদ (রহ.)-এর নিকট পড়েন। তার মেধা এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, অল্প দিনেই তিনি হানাফি ফিকহের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আয়ত্ত করে ফেলেন এবং সমসাময়িক হানাফি আলেমদের ছাড়িয়ে যান।

শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ও প্রভাব:

মাযহাব পরিবর্তনের ফলে তিনি হানাফি ফিকহকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর সুযোগ পান। যদি তিনি শাফেয়ী মাযহাবে থাকতেন, হয়তো 'রদ্দুল মুহতার'-এর মতো কালজয়ী গ্রন্থ আমরা পেতাম না। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এক বিশেষ পরিকল্পনা।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীনের শিক্ষাজীবন প্রমাণ করে যে, একজন যোগ্য উস্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা ছাত্রের জীবন বদলে দিতে পারে। শাফেয়ী থেকে হানাফিতে তার এই রূপান্তর কোনো মাযহাবি গোঁড়ামি ছিল না, বরং এটি ছিল ইলমি প্রয়োজনে ও উস্তাদের আদেশে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে।

প্রশ্ন-৫: তাঁর যুগে হানাফি ফিকহকে ফাতওয়া ও বিচার ব্যবস্থার উৎস হিসেবে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে ইমাম ইবনে আবিদীনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। কীভাবে তিনি ফিকহী মাযহাবসমূহের জন্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে পরিণত হলেন?

بين دور الإمام ابن عابدين في تعيير الفقه الحنفي كمرجع للفتوى (والقضاء في عصره، وكيف أصبح مرجعا معتمدا للمذاهب الفقهية)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে উসমানীয় খেলাফতের বিচার ব্যবস্থা ও ফাতওয়া বিভাগ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল। হানাফি মাযহাবের অসংখ্য কিতাব ও মতামতের ভিড়ে কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল—তা নির্ণয় করা বিচারকদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হন ইমাম ইবনে আবিদীন আশ-শামী (রহ.)। তিনি হানাফি ফিকহকে পুনরায় ঢেলে সাজান এবং ফাতওয়া ও বিচারকার্যের জন্য একটি সলিড বা মজবুত ভিত্তি দাঁড় করান।

হানাফি ফিকহকে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে ভূমিকা:

ইমাম ইবনে আবিদীন তার যুগে হানাফি ফিকহকে বিচার ব্যবস্থা (Judiciary) ও ফাতওয়ার (Legal Verdict) উৎস হিসেবে সক্রিয় করতে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন:

১. প্রবল ও দুর্বল মতের পার্থক্যকরণ (আত-তাময়িজ বাইনাল আকওয়াল):

তৎকালীন সময়ে অনেক মুফতি ও কাজী দুর্বল (জয়ীফ) বা বাতিল মতের ওপর ভিত্তি করে ফায়সালা দিচ্ছিলেন। ইবনে আবিদীন কঠোর হাতে এর সংস্কার করেন। তিনি 'জহিরুর রিওয়ায়াহ' (ইমাম আবু হানিফা ও তার ছাত্রদের প্রসিদ্ধ মত) এবং 'নাদিরে রিওয়ায়াহ' (বিচ্ছিন্ন মত)-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টেনে দেন। তিনি ঘোষণা করেন:

(لَا يَجُوزُ الْفَتْوَى بِالْقَوْلِ الضَّعِيفِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ)

অর্থ: "জরুরি প্রয়োজন ছাড়া দুর্বল মতের ওপর ফাতওয়া দেওয়া জায়েজ নেই।"

২. 'রসমুল মুফতি' বা ফাতওয়া প্রদানের নীতিমালা সংস্কার:

বিচারক ও মুফতিরা কীভাবে রায় দেবেন, তার জন্য তিনি একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তার রচিত 'শরহু উকুদির রসমিল মুফতি' গ্রন্থটি আজও মুফতিদের জন্য সংবিধানতুল্য। এতে তিনি দেখিয়েছেন, কখন ইমামের মত নিতে হবে, কখন সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মত নিতে হবে এবং কখন পরবর্তী মাশায়েখদের মত প্রাধান্য পাবে।

৩. সামাজিক প্রথা বা 'উরফ'-এর সঠিক প্রয়োগ:

বিচারকার্যে সমাজের প্রচলিত প্রথা (Custom) একটি বড় ভূমিকা রাখে। ইবনে আবিদীন তার গবেষণায় দেখান যে, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ফিকহের যেসব মাসআলা 'উরফ'-এর ওপর নির্ভরশীল, সেগুলোও পরিবর্তিত হতে পারে। এর মাধ্যমে তিনি ফিকহকে যুগের উপযোগী ও গতিশীল (Dynamic) করে তোলেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে (Marja') পরিণত হওয়া:

ইমাম ইবনে আবিদীন কীভাবে সকল ফিকহী মাযহাবের, বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের জন্য নির্ভরযোগ্য সূত্রে পরিণত হলেন, তার কারণগুলো নিম্নরূপ:

- **'রদ্দুল মুহতার'-এর গ্রহণযোগ্যতা:** তিনি তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার' (ফতোয়া শামী) রচনার মাধ্যমে হানাফি ফিকহের পূর্ববর্তী ১০০০ বছরের নির্যাস একত্রিত করেন। তিনি শুধু মতগুলো উল্লেখ করেননি, বরং প্রতিটি মতের দলিল যাচাই করেছেন। ফলে তার কিতাবটি হয়ে ওঠে 'ফয়সালাকারী গ্রন্থ'।

- **তাহকিক বা গবেষণার গভীরতা:** তিনি কোনো মাসআলা লেখার আগে তার উৎস, দলিল এবং যৌক্তিকতা নিয়ে গভীর গবেষণা করতেন। তার এই সূক্ষ্ম দৃষ্টির কারণে সমসাময়িক ও পরবর্তী সকল আলেম তাকে **'খাতামুল মুহাক্কিকীন'** (গবেষকদের সিলমোহর) মেনে নেন।

- **সর্বজনীন আস্থা:** উসমানীয় সুলতান থেকে শুরু করে সাধারণ বিচারক পর্যন্ত সবাই তার মতামতের ওপর আস্থা রাখতেন। সরকারিভাবে নির্দেশ ছিল যে, আদালতে ইবনে আবিদীনের ফাতওয়া অনুযায়ী রায় দিতে হবে।

আরবি ইবারত (প্রশংসা):

বিখ্যাত আলেম আল্লামা কাউসারি (রহ.) বলেন:

هُوَ خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِينَ فِي الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ، وَكِتَابُهُ "رَدُّ الْمُحْتَار" هُوَ الْمَرْجِعُ الْأَوَّلُ لِلْفَتْوَى فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ)

অর্থ: "তিনি হানাফি মাযহাবের সর্বশেষ গবেষক এবং তার কিতাব 'রদ্দুল মুহতার' মুসলিম বিশ্বে ফাতওয়ার প্রথম উৎস।"

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীন তার মেধা ও শ্রম দিয়ে হানাফি ফিকহকে বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে উদ্ধার করে একটি সুশৃঙ্খল আইনি কাঠামোতে রূপান্তর করেন। তার কারণেই হানাফি মাযহাব আজও ফাতওয়া ও বিচার বিভাগে দাপটের সাথে টিকে আছে। তিনি হানাফি ফিকহের এক অবিসংবাদিত 'অথরিটি'।

প্রশ্ন-৬: ইমাম ইবনে আবিদীনের আধ্যাত্মিক জীবন এবং তাসাউফের সাথে তার সম্পর্ক সম্পর্কে আলোচনা কর। তিনি যে সুফী তরিকাসমূহের সাথে যুক্ত ছিলেন, সেগুলোর নাম উল্লেখ কর।

تحدث من حياة الإمام ابن عابدين الروحية وعلاقته بالتصوف، واذكر (أسماء الطرق الصوفية التي انتسب إليها) [3]

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইলমে ফিকহ বা শরীয়তের বাহ্যিক জ্ঞান এবং ইলমে তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান—উভয়ের সমন্বয় ঘটালে একজন মানুষ 'রব্বানি আলেম' হতে পারেন। ইমাম ইবনে আবিদীন (রহ.) ছিলেন এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি কেবল শুষ্ক মাসআলা বর্ণনাকারী ফকিহ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন উচ্চ মাকামের একজন সুফী সাধক। তার ফিকহী গভীরতার পেছনে তার আধ্যাত্মিক সাধনার বিশাল ভূমিকা ছিল।

আধ্যাত্মিক জীবন ও তাসাউফের সাথে সম্পর্ক:

ইমাম ইবনে আবিদীন বিশ্বাস করতেন, অন্তরের পরিশুদ্ধি (তাজকিয়ায়ে নফস) ছাড়া ইলমের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভব নয়। তিনি তার জীবনের একটি বড় অংশ জিকির-আজকার, মোরাকাবা (ধ্যান) এবং বুজুর্গদের সোহবতে (সান্নিধ্যে) কাটিয়েছেন।

- **ইবাদতে মগ্নতা:** ফাতওয়া লেখা ও কিতাব অধ্যয়নের বাইরে তিনি গভীর রাতে তাহাজ্জুদে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন। তার জীবনীকারগণ লেখেন, তিনি সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকতেন এবং জিকিরে জিহ্বা সিক্ত রাখতেন।
- **আদব ও বিনয়:** তাসাউফের প্রভাবে তার চরিত্রে অসামান্য বিনয় ও নম্রতা তৈরি হয়েছিল। তিনি নিজেকে সবসময় তুচ্ছ মনে করতেন এবং আলেমদের বা বুজুর্গদের সামনে অত্যন্ত আদবের সাথে বসতেন।

তরিকাসমূহ (আসমাউত তুরুক):

তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ একাধিক সুফী তরিকার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং সেগুলোর ফয়েজ ও বরকত লাভ করেছিলেন। প্রধানত তিনি যে দুটি তরিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তা হলো:

১. নকশবন্দিয়া তরিকা (الطريقة النقشبندية):

এটি ছিল তার আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান অবলম্বন। তিনি তার যুগের মুজাদ্দিদ ও মহান আধ্যাত্মিক রাহবার শায়খ মাওলানা খালিদ আল-বাগদাদী (রহ.)-এর হাতে নকশবন্দিয়া তরিকায় বায়আত গ্রহণ করেন।

- শায়খ খালিদ তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাকে তরিকার উচ্চতর সবক প্রদান করেন।
- ইবনে আবিদীন তার শায়খের নির্দেশে আধ্যাত্মিক সাধনায় পূর্ণতা অর্জন করেন এবং খেলাফত লাভ করেন।

২. কাদেরিয়া তরিকা (الطريقة القادرية):

তিনি কাদেরিয়া তরিকার মাশায়েখদের থেকেও ফয়েজ লাভ করেছিলেন এবং এই তরিকার সিলসিলার সাথেও তার আত্মিক যোগাযোগ ছিল।

শায়খ খালিদ আল-বাগদাদীর সাথে সম্পর্ক:

তার আধ্যাত্মিক জীবনের মূল স্থপতি ছিলেন শায়খ খালিদ শাহরাজুরী আল-বাগদাদী (রহ.)। শায়খের প্রতি তার ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল অপরিসীম।

- শায়খের বিরোধীদের জবাব দেওয়ার জন্য তিনি **'সাল্লুল হুসাম আল-হিন্দি লি নুসরাতি মাওলানা খালিদ আন-নকশবন্দী'** (মাওলানা খালিদ নকশবন্দীর সাহায্যে ভারতীয় তলোয়ার কোষমুক্তকরণ) নামে একটি কিতাবও রচনা করেন। এটি প্রমাণ করে যে, তিনি পীর-মুরিদী সম্পর্ককে কতটা গুরুত্ব দিতেন।

তাসাউফের প্রভাব তার ফিকহে:

তার আধ্যাত্মিকতা তার ফিকহী রচনায়ও প্রভাব ফেলেছিল। তিনি মাসআলা বর্ণনার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন, যাতে তাকওয়ার খেলাফ কোনো কথা না আসে। তার কিতাব 'রদ্দুল মুহতার'-এর পরতে পরতে 'আদব' ও 'খোদাভীতি'র ছাপ স্পষ্ট।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীন (রহ.) প্রমাণ করেছেন যে, শরিয়ত ও তরিকত পরস্পর বিরোধী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক। তিনি ছিলেন একাধারে ফকিহ ও সুফী। তার আধ্যাত্মিক জীবন তার ইলমি জীবনকে এক বিশেষ জ্যোতি বা 'নূর' দান করেছিল, যার আলো আজও বিশ্ববাসীকে আলোকিত করছে।

প্রশ্ন-৭: 'রদ্দুল মুহতার' ছাড়া ইমাম ইবনে আবিদীনের অন্য পাঁচটি রচনার নাম উল্লেখ কর এবং সংক্ষেপে এ রচনাগুলোর প্রকৃতি বর্ণনা কর।
اذكر خمسة من مؤلفات الإمام ابن عابدين الأخرى غير رد المحتار، مع بيان طبيعة هذه المصنفات باختصار) [4]

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীন আশ-শামী (রহ.)-এর নাম শুনলেই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে তার কালজয়ী গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার' বা ফতোয়া শামীর নাম। কিন্তু এই বিশাল গ্রন্থটি ছাড়াও তিনি ফিকহ, উসুল, হাদিস, তাফসির এবং সাহিত্যের ওপর প্রায় অর্ধশতাধিক মূল্যবান গ্রন্থ ও পুস্তিকা (রিসালা) রচনা করেছেন। তার প্রতিটি রচনাই জ্ঞানগবেষণার এক একটি অনন্য স্মারক। নিচে 'রদ্দুল মুহতার' ব্যতীত তার অন্য পাঁচটি বিখ্যাত রচনার পরিচয় তুলে ধরা হলো।

১. আল-উকুদুদ দুররিয়্যাহ ফি তানকিহিল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ (العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية):

- **বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি:** এটি মূলত 'ফাতওয়া হামিদিয়্যাহ' নামক একটি বিখ্যাত ফাতওয়া গ্রন্থের পরিমার্জিত সংস্করণ। মূল কিতাবটি লিখেছিলেন মুফতি হামিদুদ্দিন আল-ইমাদি। ইবনে আবিদীন দেখলেন যে, মূল কিতাবে কিছু দুর্বল মত ও অগোছালো বিষয় রয়েছে। তিনি সেগুলোকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যাচাই-বাছাই (তানকিহ) করেন এবং শক্তিশালী মতগুলো সংকলন করেন। এটি বিচারকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত।

২. মানহাতুল খালিক আলাল বাহরিস রায়েক (منحة الخالق على البحر الرائق):

- **বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি:** হানাফি ফিকহের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ আল্লামা ইবনে নুজাইম রচিত 'আল-বাহরুর রায়েক'। ইবনে আবিদীন এই কিতাবের ওপর একটি বিস্তৃত টীকা বা হাশিয়া (Hashiya) লিখেছেন। এই হাশিয়ায় তিনি মূল কিতাবের জটিল স্থানগুলো ব্যাখ্যা করেছেন এবং ইবনে নুজাইমের অসমাপ্ত কাজগুলোকে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এটি ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

৩. শরহু মানজুমাতু উকুদির রসমিল মুফতি (شرح منظومة عقود رسم المفتي):

- **বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি:** ফাতওয়া দেওয়ার নিয়মাবলি বা 'উসুলুল ইফতা' নিয়ে তিনি নিজেই একটি কাব্যগ্রন্থ (মানজুমা) রচনা করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই এর একটি চমৎকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (শরাহ) লিখেন।

- **গুরুত্ব:** একজন মুফতি কীভাবে ফাতওয়া দেবেন, কোন কিতাব থেকে দেবেন এবং মতভেদের সময় কী করবেন—তার বিস্তারিত গাইডলাইন এতে রয়েছে। বর্তমানে মাদরাসাসমূহে ইফতা বিভাগে এটি পাঠ্যবই হিসেবে পড়ানো হয়।

৪. নশরুল উরফ ফি বিনাই বা'দিল আহকাম আলাল উরফ (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف):

- **বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি:** এটি একটি গবেষণাধর্মী পুস্তিকা (রিসালা)। ফিকহী মাসআলায় 'উরফ' বা সামাজিক প্রথার প্রভাব কতটুকু এবং সময়ের পরিবর্তনে প্রথাভিত্তিক মাসআলাগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হয়—এ বিষয়টি তিনি এখানে দালিলিক প্রমাণসহ আলোচনা করেছেন। আধুনিক ফিকহ গবেষণায় এটি একটি আকর গ্রন্থ।

৫. আস-সিল্লুল হুসাম আল-হিন্দি লি নুসরাতি মাওলানা খালিদ আন-নকশবন্দী (سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي):

- **বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি:** এটি একটি বিতর্কমূলক ও সমর্থনসূচক গ্রন্থ। তৎকালীন সময়ে তার আধ্যাত্মিক গুরু শায়খ খালিদ আল-বাগদাদীর বিরুদ্ধে কিছু লোক অপপ্রচার চালাচ্ছিল। ইবনে আবিদীন তার শায়খের

সম্মান রক্ষার্থে এবং অপপ্রচারকারীদের জবাব দিতে এই কিতাবটি রচনা করেন। এতে তার গুরুভক্তি ও তাসাউফ সংক্রান্ত জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীনের রচনাবলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তার কিতাবগুলো কেবল সংখ্যায় বেশি নয়, বরং মানে ও গুণাগুণে প্রতিটি কিতাবই একেকটি মাস্টারপিস। 'রদ্দুল মুহতার' তার মুকুটের মণি হলেও, উল্লেখিত কিতাবগুলো সেই মুকুটের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন।

প্রশ্ন-৮: ব্যবসায়ী পিতার ঘরে ইবনে আবিদীনের শৈশবের প্রকৃতি কেমন ছিল? তার সামাজিক পরিবেশ তার জ্ঞান অর্জন ও রচনায় কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল? (ما هي طبيعة نشأة ابن عابدين في بيت والده التاجر، وكيف أثرت بيئته الاجتماعية على تحصيله العلمي وانشغاله بالتأليف؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

মানুষের ভবিষ্যৎ গঠনে তার শৈশব এবং পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। প্রবাদ আছে, "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।" হানাফি ফিকহের শেষ স্তম্ভ ইমাম ইবনে আবিদীন আশ-শামী (রহ.)-এর শৈশব কেটেছিল এক কর্মব্যস্ত বাণিজ্যিক পরিবেশে। তার পিতা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। সাধারণত ব্যবসায়ীদের সন্তানরা ব্যবসার দিকেই ঝুঁকে পড়ে, কিন্তু ইবনে আবিদীন ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তবে তার পিতার ব্যবসায়িক পরিবেশ তার ফিকহী মেজাজ গঠনে এক অসামান্য ও বাস্তবমুখী ভূমিকা পালন করেছিল।

ব্যবসায়ী পিতার ঘরে শৈশবের প্রকৃতি:

ইমাম ইবনে আবিদীনের পিতা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ছিলেন দামেশকের একজন স্বনামধন্য ও আল্লাহভীরু ব্যবসায়ী (তাজির)। ইবনে আবিদীনের শৈশব ছিল বৈচিত্র্যময়:

- **দোকানে অবস্থান:** ছোটবেলায় তিনি প্রায়ই পিতার সাথে দোকানে যেতেন। দামেশকের ব্যস্ত বাজারে পিতার দোকানের এক কোণে তিনি চুপচাপ বসে থাকতেন।

- **কুরআনের সাথে সখ্যতা:** দোকানের হট্টগোল, ক্রেতা-বিক্রেতার দরদাম এবং বাজারের কোলাহল—কোনোকিছুই তাকে অমনোযোগী করতে পারত না। তিনি দোকানের ক্যাশ বাক্সের পাশে বসে নিবিষ্ট মনে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

- **অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য:** সমবয়সী শিশুরা যখন খেলাধুলায় মগ্ন থাকত, তখন শিশু ইবনে আবিদীন জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করতেন। তার চেহারায় সর্বদা এক ধরণের গাম্ভীর্য ও নূরানি আভা ফুটে থাকত।

একটি স্মরণীয় ঘটনা:

একদিন এক কামেল বুজুর্গ ব্যক্তি তাদের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শিশু ইবনে আবিদীনকে দোকানের কোণে বসে গভীর মনোযোগে কুরআন পড়তে দেখলেন। তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করলেন:

(إِنَّ لِهَذَا الصَّبِيِّ شَأْنًا عَظِيمًا، إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا كَبِيرًا أَوْ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ)

অর্থ: "নিশ্চয়ই এই শিশুর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। সে হয় অনেক বড় আলেম হবে, অথবা আল্লাহর ওলিদের একজন হবে।"

পরবর্তীতে সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল।

সামাজিক পরিবেশের প্রভাব জ্ঞান অর্জন ও রচনায়:

পিতার ব্যবসায়িক ও সামাজিক পরিবেশ ইবনে আবিদীনের ফিকহী চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যা তাকে নিছক একজন 'কিতাবি মুফতি' থেকে 'বাস্তবমুখী ফকিহ'-এ পরিণত করেছিল।

১. ফিকহুল মুআমালাত (লেনদেনের বিধান)-এ দক্ষতা:

ব্যবসায়ী পরিবারে বেড়ে ওঠার কারণে তিনি ক্রয়-বিক্রয়, লাভ-ক্ষতি, অংশীদারি কারবার (মুদারাবা/মুশারাকা) এবং বাজারের রীতিনীতি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। ফলে তার কিতাব 'রদ্দুল মুহতার'-এর 'কিতাবুল বুইউ' (ব্যবসা পর্ব) অধ্যায়টি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বাস্তবসম্মত হয়েছে। তিনি বুঝতে পারতেন, ব্যবসায়ীরা বাস্তবে কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়।

২. জনসম্পৃক্ততা ও উরফের জ্ঞান:

দোকানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আসত। তাদের কথাবার্তা ও লেনদেন থেকে তিনি সমাজের 'উরফ' (প্রথা) এবং মানুষের মন-মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। ফিকহী মাসআলায় 'উরফ'-এর সঠিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা তাকে সহায়তা করেছে।

৩. সময়ের মূল্যবোধ:

ব্যবসায়ীরা যেমন সময়ের কদর করেন, তেমনি তিনি ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন, "ব্যবসায় লাভ না হলে যেমন দিনটি বৃথা যায়, তেমনি ইলমের নতুন কিছু না শিখলে আমার দিনটি বৃথা মনে হয়।"

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীনের শৈশব প্রমাণ করে যে, পরিবেশ যেমনই হোক না কেন, আল্লাহর ইচ্ছা ও নিজের প্রচেষ্টা থাকলে ইলমের শিখরে পৌঁছানো সম্ভব। ব্যবসায়ী পিতার ঘরে জন্ম নিয়েও তিনি ব্যবসার মোহ ত্যাগ করে ইলমের সাধনায় মগ্ন ছিলেন, কিন্তু সেই ব্যবসায়িক পরিবেশের অভিজ্ঞতাকে তিনি ফিকহের কাজে লাগিয়ে উম্মাহর জন্য এক বিশাল সম্পদ রেখে গেছেন।

প্রশ্ন-৯: ইবনে আবিদীনের জ্ঞানগত জীবনে দামেশক শহরের ভূমিকা আলোচনা কর। কেন তাকে (শামী/সিরীয়) উপাধি দেওয়া হয়েছিল?
(ناقش الدور الذي لعبته مدينة دمشق في مسيرة ابن عابدين العلمية، ولماذا لقب بـ الشامي؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

স্থান কাল ও পাত্র—জ্ঞানের বিকাশে এই তিনটি উপাদানের গুরুত্ব অপরিসীম। ইমাম ইবনে আবিদীন (রহ.) যে শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেটি কোনো সাধারণ শহর ছিল না। সেটি ছিল নবী-রাসূলদের স্মৃতিবিজড়িত এবং ইলমের অন্যতম কেন্দ্রভূমি—দামেশক। তার জ্ঞানগত উৎকর্ষ সাধনে এই ঐতিহাসিক নগরীর ভূমিকা ছিল মায়ের মতোই। তাকে বিশ্বব্যাপী যে নামে চেনে—'আশ-শামী'—তা এই অঞ্চলের সাথেই সম্পৃক্ত।

জ্ঞানগত জীবনে দামেশক শহরের ভূমিকা:

তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে কায়রো (মিসর) ও ইস্তাম্বুলের (তুরস্ক) পর দামেশক ছিল ইলম চর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। ইমাম ইবনে আবিদীনের জীবনে এই শহরের অবদান নিম্নরূপ:

১. আলেমদের মিলনমেলা (মাজমাউল উলামা):

দামেশক ছিল বড় বড় মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং সুফী সাধকদের আবাসস্থল। ইবনে আবিদীন সহজেই তার বাড়ির কাছেই শ্রেষ্ঠ উস্তাদদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। শায়খ সাঈদ আল-হামাউয়ী, শায়খ শাকির আল-আক্কাদ এবং শায়খ খালিদ আল-বাগদাদীর মতো বিশ্বখ্যাত মনিষীরা তখন দামেশকেই অবস্থান করতেন।

২. সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও পাণ্ডুলিপি (আল-মাকতাবাত):

দামেশকের প্রাচীন লাইব্রেরিগুলোতে ছিল দুর্লভ কিতাবের ভাণ্ডার। 'রদ্দুল মুহতার' লেখার সময় ইবনে আবিদীন এমন সব প্রাচীন হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি (Makhtutat) দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, যা বিশ্বের অন্য কোথাও পাওয়া দুষ্কর ছিল। তিনি নিজেই তার কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দামেশকের কুতুবখানাগুলো থেকে প্রচুর সহায়তা নিয়েছেন।

৩. আধ্যাত্মিক আবহ:

দামেশকের মসজিদগুলো, বিশেষ করে উমাইয়া মসজিদ ছিল রুহানিয়াতের কেন্দ্র। এখানকার আধ্যাত্মিক পরিবেশ তাকে তাসাউফ চর্চায় উৎসাহিত করেছিল।

'আশ-শামী' (الشامي) বা সিরীয় উপাধি লাভে কারণ:

ইমাম ইবনে আবিদীনের নামের শেষে সর্বদা 'আশ-শামী' শব্দটি যুক্ত থাকে। এর কারণগুলো হলো:

১. ভৌগোলিক নিসবত (সম্পৃক্ততা):

আরবি ভাষায় 'শাম' (الشام) বলতে বর্তমান সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বোঝানো হয়। আর দামেশক হলো শামের হৃদয় বা রাজধানী। যেহেতু তিনি দামেশকে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেখানেই বেড়ে উঠেছেন

এবং সেখানেই আজীবন ইলমি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তাই তাকে তার মাতৃভূমির দিকে সম্পৃক্ত করে 'আশ-শামী' বা 'শামদেশীয়' বলা হয়।

২. কিতাবের পরিচিতি:

তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার'-কে সংক্ষেপে 'ফতোয়া শামী' (ফাতাওয়া শামী) বলা হয়। ভারত উপমহাদেশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আলেমদের মুখে মুখে এই নামটি প্রচলিত। 'শামী' শব্দটি এখন আর শুধু একটি অঞ্চলের নাম নয়, বরং এটি বিশুদ্ধ হানাফি ফিকহের একটি 'ব্র্যান্ড' বা প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

৩. ঐতিহাসিক প্রথা:

প্রাচীনকাল থেকেই আলেমদের নামের শেষে তাদের শহরের নাম যুক্ত করার প্রথা ছিল (যেমন: আল-বুখারী, আল-রাজী)। ইবনে আবিদীন এই ঐতিহ্যেরই ধারক। তিনি গর্বের সাথে নিজেকে 'দামেশকী' ও 'শামী' হিসেবে পরিচয় দিতেন।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

দামেশক শহর ইমাম ইবনে আবিদীনকে বুকে ধারণ করে লালন-পালন করেছে, আর ইমাম ইবনে আবিদীন তার ইলমের আলো দিয়ে দামেশকের নামকে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল করেছেন। 'আশ-শামী' উপাধিটি তার দেশপ্রেম এবং নিজ অঞ্চলের প্রতি তার কৃতজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রশ্ন-১০: শেষ যুগে হানাফি ফিকহকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে ইবনে আবিদীনের প্রচেষ্টা পর্যালোচনা কর এবং তার পরবর্তী ফকীহ ও ছাত্রদের উপর তার ফিকহের প্রভাব উল্লেখ কর।

(استعرض جهود ابن عابدين في إحياء الفقه الحنفي في العصر المتأخر، مع ذكر أثر فقهه على العلماء والتلاميذ من بعده)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

যেকোনো মাযহাব বা মতাদর্শ দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাতে কিছু শিথিলতা বা অপ্রামাণিক বিষয় অনুপ্রবেশ করতে পারে। হিজরি দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হানাফি মাযহাবের অবস্থাও অনেকটা সেরকম ছিল। অনেক দুর্বল ও ভিত্তিহীন ফাতওয়া মাযহাবের নামে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ

তাআলা ইমাম ইবনে আবিদীন আশ-শামী (রহ.)-কে 'মুজাদ্দিদ' (সংস্কারক) হিসেবে কবুল করেন। তিনি হানাফি ফিকহকে আগাছামুক্ত করে পুনরুজ্জীবিত করেন।

হানাফি ফিকহ পুনরুজ্জীবনে (ইহইয়া) তার প্রচেষ্টা:

ইমাম ইবনে আবিদীন তার ক্ষুরধার লেখনী ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে হানাফি ফিকহে যে সংস্কার এনেছেন, তা অতুলনীয়:

১. মাসআলার যাচাই-বাছাই (তানকিহ ও তাহকিক):

তিনি অন্ধ অনুকরণ (তাকলিদ মাহয) এর বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু দালিলিক ভিত্তি ছাড়া কোনো কথা মানতেন না। তিনি পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর (যেমন: বাহরুর রায়েক, নহরুল ফায়েক, দুররুল মুখতার) প্রতিটি মাসআলা যাচাই করেছেন। যেখানেই তিনি কোনো দুর্বলতা দেখেছেন, সেখানেই তিনি টীকা (Hashiya) লিখে সঠিক মতটি তুলে ধরেছেন।

২. জহিরুর রিওয়ায়াহ-কে প্রাধান্য দান:

হানাফি মাযহাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর ৬টি কিতাবকে 'জহিরুর রিওয়ায়াহ' বা মূল ভিত্তি ধরা হয়। পরবর্তী যুগে অনেকে এই মূল ধারা থেকে সরে যাচ্ছিলেন। ইবনে আবিদীন সকলকে আবার সেই মূল ধারায় ফিরিয়ে আনেন। তিনি বলেন, মাযহাবের আসল মত সেটাই, যা ইমাম আবু হানিফা ও তার ছাত্রদের থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

৩. নতুন সমস্যার সমাধান (নাওয়াজিল):

তার যুগে অনেক নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল যা পূর্ববর্তী কিতাবে ছিল না। তিনি 'কিয়াস' (Analogy) এবং ফিকহী উসুলের আলোকে সেগুলোর সমাধান দেন।

পরবর্তী ফকিহ ও ছাত্রদের ওপর প্রভাব:

ইমাম ইবনে আবিদীনের ইন্তেকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত—গত প্রায় ২০০ বছরে হানাফি মাযহাবের ওপর তার প্রভাব একচ্ছত্র।

- **ছাত্রদের মাধ্যমে প্রচার:** তার প্রধান ছাত্র এবং নিজের পুত্র **আলাউদ্দিন ইবনে আবিদীন** তার অসমাপ্ত কাজগুলো এগিয়ে নেন। তারা 'শামী'র ফিকহী ধারাকে জীবিত রাখেন।

- **পরবর্তী আলেমদের নির্ভরতা:** দেওবন্দি, বেরলভী বা আল-আজহারি—হানাফি মাযহাবের যে ধারার আলেমই হোক না কেন, ফাতওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সবাই ইবনে আবিদীনের মুখাপেক্ষী। ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকিহ আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), মুফতি কিফায়াতুল্লাহ (রহ.) এবং আলা হযরত আহমদ রেজা খান (রহ.)—সবাই ইবনে আবিদীনকে তাদের ফিকহী মুরুব্বি বা 'উস্তাদ' হিসেবে মান্য করেছেন।

- **আদালতে প্রভাব:** ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে বর্তমান বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের পারিবারিক আইনে মুসলিম বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত রায়ে বিচারকরা 'রদ্দুল মুহতার'-কে অথেনটিক সোর্স হিসেবে উদ্ধৃত করেন।

আরবি ইবারত:

তার কিতাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়:

(مَنْ لَمْ يَقْرَأْ "رَدَّ الْمُحْتَارِ" لَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي الْمَذْهَبِ)

অর্থ: "যে ব্যক্তি 'রদ্দুল মুহতার' পড়েনি, মাযহাবে ফাতওয়া দেওয়ার অধিকার তার নেই।"

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীন (রহ.) হানাফি ফিকহকে মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করে তাকে এক নতুন ও সতেজ রূপ দান করেছেন। তিনি ছিলেন হানাফি মাযহাবের শেষ আলোকবর্তিকা। তার প্রচেষ্টা ছাড়া পরবর্তী যুগের ফকিহগণ সঠিক পথের দিশা পেতেন না। কিয়ামত পর্যন্ত তার এই অবদান সদকায়ে জারিয়া হিসেবে অব্যাহত থাকবে।